ইন্দো-প্যাসিফিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি প্রয়োগের অভিমুখে যাত্রা

অম্বিকা বিশ্বনাথ ও অদিতি মুকুন্দ

২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন আর বাড়তে থাকা উদ্বেগের মধ্যেও, ইন্দো-প্যাসিফিক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণতম অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। চল্লিশটি অর্থনীতি এই ভাগ করে নেওয়া পরিসরটিকে গড়ে তুলেছে এবং এখানেই বিশ্বের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ (প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন) ও অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে উৎপাদিত ৪৭.১৯ ট্রিলিয়ন সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই অঞ্চলে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তনের ভয় অনেক বেশি। এই পরিবর্তন লক্ষ লক্ষ প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর তার গভীর প্রভাব পড়বে। এই অঞ্চলের কৌশলগত তাৎপর্য ও সম্ভাব্য দুর্বলতাকে চিহ্নিত করার পর, পৃথিবীর মুখ্য ভূ-রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই – তাঁদের অবস্থান এই অঞ্চলে হতে পারে বা এর বাইরে – গত দশকের অনেকটা সময় ধরে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নির্মিত নীতি ও কার্যক্রমকে প্রসারিত করেছেন। জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সহ এই খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই তাঁদের কৌশলের মধ্যে জলবায়ু বিষয়ক নিরাপত্তা এবং তার নানা দিককে যোগ করেন। কিন্তু যদি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদাকে বিবেচনা না করা হয়, তাহলে একটি ভূ-রাজনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে জলবায়ু সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে সম্বোধন করার বিষয়টি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

কুবারনাইন ইনিশিয়েটিভে আমাদের গবেষণা জলবায়ু পরিবর্তন (আবহাওয়ার নকশা আর পৌনঃপুনিক তীব্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে) ও নাগরিক উন্নয়নের পাশাপাশি "গতানুগতিক" নিরাপত্তা-বিষয়ক উদ্বেগের মধ্যে আন্তঃসংযোগের যে প্রভাব মানুষের উপর পড়ে, তার উপর মনোযোগ দিয়েছে। অত্যন্ত ঘন ঘন ভূমিকম্প ও সুনামি ঘটে বলে, ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে "ওয়ার্ল্ড হ্যাজার্ড বেল্ট" বলে অভিহিত করা হয়। এই অঞ্চলের বিপদগুলির মধ্যে আছে ক্রমশ উঁচু হতে থাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্রের জলের অম্লীকরণ এবং টাইফুন, সাইক্লোন, বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ আরও অনেক কিছু। ২০৫০ সাল নাগাদ, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষই জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হবেন বলে মনে করা হয়, এবং এই হার ২০২০ সালের পর ১৫ শতাংশ বেড়ে গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, জনগোষ্ঠীর অভিবাসন, প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব, নগরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ, জীবিকা ও অর্থনীতির নিরাপত্তা, কৃষিকেন্দ্রিক উৎপাদনশীলতা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত জীবিকার মত বিষয়গুলির উপর একটি ক্যাস্কেডিং এফেক্ট হতে দেখা যায়। এই ক্যাস্কেডিং এফেক্টের কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনকে "বিপদ বর্ধনকারী" বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এর উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সারা পৃথিবীতে যত মাছ ধরা হয় তার পঞ্চাশ শতাংশের অধিক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে হয়, যা অন্যান্য যে কোনও অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি। তবে সমুদ্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলের লবণাক্ততায় বৃদ্ধি, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির মত বিষয়গুলি মাছ ও অন্যান্য জল প্রাণীর উপস্থিতি ও লভ্যতাকে প্রভাবিত করে। এর ফলে যে সব

জনগোষ্ঠীর জীবিকা মাছ ধরা, তাঁদের জীবনধারণের উপায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইল্লিগাল, আনরিপোর্টেড, অ্যান্ড আনরেগুলেটেড (আইইউইউ) মাছ ধরার হার বেড়ে যায়। এই অঞ্চলের মাছ ধরার কাজ ও সুযোগ কমে গেলে তার নেতিবাচক প্রভাব মহিলা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপরেই সবচেয়ে বেশি পড়বে, কারণ এঁরাই সাধারণত উপার্জনের জন্য মাছ ধরা পেশার উপর নির্ভরশীল। যেমন, এশিয়ার জলকেন্দ্রিক শিল্পে জড়িত কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৭২ শতাংশই মহিলা। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাঁদের জীবনধারণের উপায় বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এবং তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং জলকেন্দ্রিক শিল্পের উন্নতিতে তাঁদের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বহুজাতিক প্রকৃতিকে চিহ্নিত করার পরে বোঝা গেছে যে, জলবায়ুকেন্দ্রিক কার্যকলাপের দায়িত্ব কেবলমাত্র কোনও একটি রাষ্ট্রের নয়। এই কার্যকলাপকে সমবেত ও সহযোগিতামূলক হতে হবে যার মনোযোগ আঞ্চলিক সংগঠন ও প্রশাসনের উপরেও থাকবে। যথার্থ ফলাফল পাওয়ার জন্য এখন একটি অন্তর্ভুতির ধারণাকেও সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের অংশীদারদের আরও বেশি সংখ্যায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। অভ্যস্ত কৌশলগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি, এই অঞ্চলকেন্দ্রিক "মিনিল্যাটারাল" বা "ক্ষুদ্রতর" গোষ্ঠীর হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পন্থাটিও কাজে দিচ্ছে। যেমন, নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিষয়গুলি সহ, সমস্ত নীতির অঙ্গ হিসেবে লিঙ্গপরিচয় ও সাম্যকে বিবেচনা করাকে নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা, এএসইএএন-এর জেন্ডার মেনস্ট্রিমিং ফ্রেমওয়ার্কের মত জিনিসগুলির মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সংস্থা তাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের কেন্দ্রে রাখলেও, বিপদ ঠিক *কোথায়* তা বোঝা এবং তা *কাদের* প্রভাবিত করে সেটা বোঝার মধ্যে অনেকটা দূরত্ব আছে। এই দূরত্বের কারণে জলবায়ু-সংক্রান্ত নিরাপত্তার বিষয়টির উন্নতি অনেকটাই পিছিয়ে যায়। জলবায়ুর জন্য ধার্য আর্থিক অনুদানের পরিমাণ, লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি, এবং নিঃসরণ হ্রাসের নিশানা নির্ধারণের মত বিষয়ে এই অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পে অগ্রসর, উন্নত দেশ এবং কম-উন্নত দেশের মধ্যে অনেকটাই তফাৎ আছে এবং এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। মানবজাতির নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশ্নগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও এই প্রভেদগুলি থেকেই যায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এই অঞ্চলে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্টেন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ (এইচআরডিআর) সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য সামরিক শক্তির ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলা সত্ত্বেও, সামরিক নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ, জলবায়ু-কেন্দ্রিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়ের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্য চিন এবং পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে এই দেশগুলি জলবায়ুসংক্রান্ত কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা শুরু করতেই পারে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে নিরাপদ করতেই এরা অনেক বেশি উৎসাহী। জলবায়ু পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী পরিণাম কি হতে পারে, তার ধারণা ও সংজ্ঞা আজও সুনির্ধারিত নয়, এবং অন্তর্ভুক্তির ধারণার মানদণ্ডে এই সংক্রান্ত নীতির মূল্যায়নের গুরুত্ব বুঝতে এখনো অনেক দেরি আছে।

অন্তর্ভুক্তির ধারণার অনুপস্থিতি

জলবায়ু-কেন্দ্রিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির বর্তমান অনুপস্থিতিটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়। প্রথমত, মহিলা এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সামঞ্জস্যহীন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবকে উপেক্ষা করা হয়। এই দুর্বলতার প্রসার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও ভৌগলিক অঞ্চল নির্বিশেষে ঘটতে পারে, তাই একটি অঞ্চল জুড়ে বিচিত্র সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের উন্নয়নশীল দ্বীপ-রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ উঁচু হতে থাকা সমুদ্রতলের মত বিপদের মুখোমুখি হয়েছে আর এদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি অনেক ঘন ঘন সুতীব্র ঝড়ের মুখে পড়ছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

ও বাংলাদেশ সমস্ত বিশ্বের গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের যথাক্রমে মাত্র ০.০৩ শতাংশ ও ০.০৪ শতাংশের জন্য দায়ী হওয়া সত্ত্বেও সামঞ্জস্যহীনভাবে ক্যাসকেডিং এফেক্টের সম্মুখীন হয়। যেমন, সমুদ্রতলের উত্থান এবং জমিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার কৃষিযোগ্যতা চলে যাওয়ার কারণে ফিজি দ্বীপের ৪২টি গ্রামকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করতে হয়। বাংলাদেশ আগামী দশকগুলিতে প্রতি বছরই অন্তত একটি করে সুপার সাইক্লোনের মুখোমুখি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, জলবায়ু বিষয়ক বহুপাক্ষিক বৈঠকে প্রান্তিক কণ্ঠের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। লিঙ্গপরিচয়ের প্রতি অমনোযোগ বা অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা ছাড়াই জলবায়ু নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ বিপদের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়। কিছু বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলের নির্দিষ্ট কয়েকটি সমাজব্যবস্থায়, যেখানে কৃষিশিল্প ও সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মহিলাদের ভূমিকা প্রধান, সেখানে এই প্রভাব বিশেষ করে প্রকট। এই ঘটনাটি নথিভুক্ত ও প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও, নীতি ও কর্মপন্থায় কোনও পরিবর্তন আনার জন্য এগুলিকে ব্যবহার করা হয় না। এই জাতীয় বৃত্তি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ব্যাহত হওয়ার ফলে মহিলাদের জীবিকা বিপন্ন হয়, এবং বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্য আরও বাড়ে শুধু নয়, একটি রাজ্যের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও এর ফলে বিঘ্নিত হয়। ২০১৪ সালের একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, যে সমস্ত সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থান নিম্নস্থ, সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সরাসরি প্রভাবে বা তার সঙ্গে জড়িত বিপর্যয়-পরবর্তী ঘটনাবলীর কারণে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি। যেমন, ২০০৪ সালে ঘটা ভারত মহাসাগরের সুনামির কারণে মৃতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই মহিলা। যে সমস্ত নীতি ও কর্মপন্থা অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা না করেই এগোবে, সেগুলি পরবর্তীকালে ব্যর্থ হবেই।

সম্ভব হলে, আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন প্রক্রিয়াগুলিকে হাইপারলোকাল আর্থসামাজিক বাস্তবতার বিষয়ে অবগত থাকতে হবে। জলবায়ুর বিষয়ে কার্যকলাপ সার্বজনীন হতে পারে না, বরং তাকে নির্দিষ্ট প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে, যে সব দেশীয় ও স্থানীয় আচারের প্রতিবন্ধক জয় করে ঘুরে দাঁড়ানর ইতিহাস আছে, সেগুলির থেকে শিক্ষাও নিতে হবে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির ধারণাকে প্রচারের উদ্যোগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরম্ভ হয়ে ওঠে। এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত-নির্ভর আরম্ভের প্রকৃতি হতে হবে সহযোগিতামূলক, যা আবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আর আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণকেও বিবেচনা করবে।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, অস্ট্রেলিয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড'জ ডেভেলপমেন্ট পলিসি, সারা বিশ্বে এই দেশের যত অংশীদার দেশ আছে, সেখানে বিনিয়োগের ৮০ শতাংশ লিঙ্গ সাম্য নিশ্চিত করার প্রতি দায়বদ্ধ এবং তার পাশাপাশি, এই বিভাগের যত প্রকল্প আছে তার অন্তত অর্ধেকের লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি। জলবায়ুর জন্য ধার্য অনুদানের মধ্যে যে ফাঁক দেখা যায় তা পূরণ করতে ও তার সঙ্গে সঙ্গে, মহিলাদের দাবি মেটানর প্রচেষ্টার দিকে এক কদম এগিয়ে দিতে পারে এই ধরনের উদ্যম। এই জাতীয় পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সারা বিশ্বের অনুদানকেন্দ্রিক প্রকল্পের মাত্র ০.০১ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তন ও মহিলাদের অধিকার, এই দুই বিষয়কেই সম্বোধন করে। এমন সহযোগিতামূলক পন্থার একটি উদাহরণ হল, অ্যাকশানএইড অস্ট্রেলিয়া, মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং হুয়াইরু কমিশন যা দেশের গ্রামীণ ও আদিবাসী গোষ্ঠীকে সহায়তা করে এমন একটি মহিলা-পরিচালিত তৃণমূল স্তরের সামাজিক আন্দোলন - এইগুলির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জেন্ডার রেসপন্স অল্টারনেটিভ ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ নামের একটি প্রকল্পের প্রতি অস্ট্রেলিয়ার অকুণ্ঠ সমর্থন।

অংশীদারিত্ব

ইন্দো-প্যাসিফিকের মত একটি জটিল, ভূ-রাজনৈতিক ভূখণ্ডকে বোঝার জন্য, একটি লিঙ্গ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করার সময় "নির্দেশমূলক" অবস্থানের বদলে "অংশীদারিত্ব"-এর পন্থার উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি নকশা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়া ঝুঁকি ও নিরাপত্তার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে এমন স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে, তা থেকে ইন্দো-প্যাসিফিকের জলবায়ুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাটি অনেক জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। লিঙ্গপরিচয় ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতের সংযোজন যে কোন সুবিশাল পরিবর্তন আনবে এমন নয়, কিন্তু এর সাহায্যে বর্তমান ব্যবস্থার যে অনধিগম্যতা তা হয়ত ভাঙবে, আর এই দুই অন্তর্ভুক্তি হয়ত একত্রে বর্তমান উদ্যোগগুলি প্রসারিত করবে। এই পদক্ষেপটির ফলে এমন একটি অবস্থা তৈরি হবে যা শেষ পর্যন্ত আর্থিকভাবে হিতকর হবে এবং ফলত, একটি বলিষ্ঠ নিরাপত্তাকেন্দ্রিক প্রতিরোধও তৈরি হবে।

এই বিষয়ের যে উদাহরণটি মাঝে মাঝেই উল্লেখ করা হয়, সেটি হল বেয়ারফুট কলেজের "সোলার মামা'জ প্রোজেক্ট"। প্রশাসন, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সেক্টরের সহযোগিতায় নির্মিত ও পরিচালিত এই প্রকল্প মূলত গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর মহিলাদের সৌর প্যানেল বসানর কাজে প্রশিক্ষণ দেয়, যা তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম করে ও ক্ষমতায়নে সাহায্য করে। ২০১৯-২০ সালের মধ্যে বেয়ারফুট কলেজ ২৯১ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যাঁরা সারা পৃথিবীর ৬২৬টি জনগোষ্টীর ৪৫,৫৯১টি বাড়িতে পরিচ্ছন্ন শক্তি আনতে সহায়তা করে চলেছেন। এই প্রশিক্ষণ মহিলাদের হাতে একটি রোজগারের উপায় তুলে দিচ্ছে যার ফলে তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা তৈরি হচ্ছে ও তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে তুলছে। বেয়ারফুট কলেজের আরেকটি কার্যক্রমের মাধ্যমে এমন ১৫০০ জন শিশুকে শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে যাদের এতদিন পর্যন্ত শিক্ষালাভের কোনও সুযোগ ছিল না।

একই ভাবে, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ) কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই)-এর মাধ্যমে সহযোগিতা ও অন্তর্ভুক্তির ধারণাকে জলবায়ুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে প্রচেষ্টা, তাতে সামিল করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এই দুই সংস্থা ইন্দো-প্যাসিফিক ও গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি তাদের প্রশ্ন ও উদ্বেগ জানাতে, শক্তির সহজলভ্যতার বিষয়ে সমন্বয় আনতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর ত্রাণ গ্রহণ বা সরবরাহ করতে, এবং প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। আইএসএ ও সিডিআরআই-এর অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় লিঙ্গপরিচয়-কেন্দ্রিক কার্যকলাপকে এইগুলির সঙ্গে যুক্ত করে এই মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়। এতে কোন নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের সময় লিঙ্গপরিচয় ও মহিলাদের উপর নীতিগুলির প্রভাবের ভিন্নতাকে বিবেচনা করে দেখা হবে এবং কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে মহিলাদের আহ্বান করা হবে। ২০২৩ সালের জি২০-র আয়োজক হিসেবে ভারত একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্য নির্মিত একটি প্রাথমিক দল তৈরিতে নেতৃত্ব দেয়। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক যা মহিলাদের দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমাতে তাঁদের যে ব্যাপক ভূমিকা আছে তা স্বীকার করে, তার মূলনীতি থেকে এই দলটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে বিপদ ও সমস্যাগুলি তৈরি হয় তা একই রকম হলেও, তাদের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য নির্মিত কর্মপন্থায় জলবায়ুকেন্দ্রিক কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পক্ষপাতশূন্যভাবে যুক্ত করার পদক্ষেপটিকে হতে হবে সর্বাঙ্গীণ, অর্থাৎ যা আবহাওয়া, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা দিকের আন্তঃসম্পর্কের কথা বিবেচনা করে। পররাষ্ট্র নীতি, ও তার পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে আগ্রহী

দেশগুলির লিঙ্গপরিচয় ভিত্তিক নীতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান নারীবাদী আলোচনার বিষয়ে আমাদের যে গবেষণা, তা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন দিকের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে বিবেচনা করে এমন সর্বাঙ্গীণ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। জলবায়ু নিয়ে ওই আগ্রহী দেশগুলির যা লক্ষ্য, তার সঙ্গে এই কৌশলগুলিকে শুধু জুড়ে নিতে হবে। জলবায়ু বিষয়ক নীতি ও কর্মপন্থাকে বিচ্ছিন্ন রাখা উচিত নয়, বরং বৃহত্তর কর্মপন্থার পরিকাঠামোর সঙ্গে এই নীতিগুলির এমনভাবে বিজড়িত থাকা দরকার, যাতে তা ওই অঞ্চলের জটিলতাকে প্রতিফলিত করতে পারে।

ভারতের মুম্বাই শহরের বাসিন্দা অম্বিকা বিশ্বনাথ কুবারনাইন ইনিশিয়েটিভের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ভূ-রাজনীতির বিষয়ে একজন পরামর্শদাতা। তিনি একজন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জল নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। প্রশাসন ও পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে এবং তিনি লিঙ্গ ও পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে কুবারনাইন ইনিশিয়েটিভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটিকে নেতৃত্ব দেন।

অদিতি মুকুন্দ কুবারনাইন ইনিশিয়েটিভের একজন প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট। তিনি লিঙ্গ ও পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে কার্যকলাপ ও প্রকল্পগুলির নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এছাড়াও তিনি উইমেন ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স নেটওয়ার্ক নামের সংস্থাটি চালনা করেন। ভারত ও গ্লোবাল সাউথের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে, এই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি ও গুরুত্ব বাড়ান, পররাষ্ট্র নীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রচেষ্টা করে।